চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা কাব্যধারায় ব্যক্তি মিথের রূপান্তর

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা কাব্যধারায় ব্যক্তি মিথের রূপান্তর

বোদলেয়ার একদা মন্তব্য করেছিলেন, একই সংগীত বিভিন্ন শ্রোতার মনে ভিন্নতর আবেদন ও মূর্ছনা সৃষ্টি করে। লেভি স্ট্রোস বলেন, মিথ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। একই মিথ ভিন্ন ভিন্ন কবির কাছে নানা কল্পনায় আবর্তিত হয়।

পৃথিবীতে আদিতম মিথ হল উর্বরতা মিথ। ইতিহাসের ধারায় দেখা যায় মানবসভ্যতা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবী হয়ে এক স্থানে স্থিতিলাভ করল। এ কথা মানতে হয় স্থিতিলাভ না করলে পঠন-পাঠন সম্ভব হয় না। কৃষিসভ্যতার পর থেকে মানুষ ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগল। তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কারণ জানা যায় না। কিন্তু তারা লক্ষ্য করল রোদ, জল এবং মাটির সুষম সংহতির উপর ফলন নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি দুইই ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক। সূর্যের উত্তাপও প্রয়োজন এবং মাটির উর্বরতা সর্বত্র সমান নয়। অতএব পর্যাপ্ত ফসলের জন্য সূর্য, বৃষ্টি, মৃত্তিকা পূজা প্রচলিত হল। ঋগ্বেদের কালে তিনজন শক্তিশালী দেবতার উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়, সূর্য, অগ্নি ও ইন্দ্র। অগ্নির তিনটি রূপ যজ্ঞাগ্নি, সূর্যের আলো ও বিদ্যুৎ। ইন্দ্র আকাশ বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা। তিনি অগ্নির যমজ ভাই। সূর্য স্বয়ং ঈশ্বর।

বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্বে দেবতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তেত্রিশ। কিন্তু এঁদের সবার ওপরে আছেন মহাপিতা জিয়ুস (গ্রীক দেবতা জিয়ুস স্মর্তব্য) অন্যজন পৃথিবীমাতা।

স্বভাবতই বৈদিক সমাজের চিন্তা হিন্দু সভ্যতার বিবর্তনের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। বেদের অ্যানিমিস্টিক দেবতাগণ পৌরাণিক যুগে বিশিষ্ট মূর্তি (অ্যানথ্রোমরফিক) লাভ করেছেন। এমন-কি কোনো কোনো দেবতার চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেমন বৈদিক দেবতা মিত্রর সঙ্গী বরুণ অন্যতম অন্তরীক্ষ দেবতা ছিলেন, তিনি হলেন জলদেবতা। ইন্দ্র সম্পূর্ণ জাগতিক সম্রাটের প্রতিবিম্ব রূপে চিত্রিত হলেন। তিনি সাম্রাজ্য হারাবার ভয়ে সশঙ্ক। এমন-কি প্রায়ই পরাজিত হন এবং তাঁর নৈতিক চরিত্রও দূষিত।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসারে আর্যরা ভারতবর্ষে কৃষিসভ্যতার পত্তন করেন। অনার্যরাও কিন্তু অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল। স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য দেখে লক্ষ্মণ অবাক হয়েছিলেন। সুগ্রীবের রাজসভায় নামকরা চিকিৎসক সুষেন ছিলেন। তাঁরও ঐশ্বর্য ও সৈন্যবল কম ছিল না। এ-সবের বিবরণ রামায়ণে আছে। কৃষিজীবী আর্যরা চাষের জন্য বনজঙ্গল কাটতে লাগল। ফলে অনার্যরা দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটির আর-একটি অর্থ বৃক্ষ। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তাঁর হাতিয়ার ছিল কুড়াল বা কুঠার। এটিকে প্রতীক বলে মনে করা যায়। এক গবেষক[১] — অবশ্য বলছেন রাবণের 'লঙ্কা' ছোটনাগপুরের (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ অন্তর্গত) মালভূমিতে অবস্থিত, বর্তমান জব্বলপুরের কাছাকাছি। তিনি গোন্ড উপজাতির লোক ছিলেন। এ তর্কে না গিয়েও বলা যায় রাবণের রাজধানী যেখানেই থাক্, দক্ষিণ ভারত পূর্বভারতের মতো অনার্য-অধ্যুষিত ছিল।

আর্যদের প্রাচীনতম মহাকাব্য এই কৃষি অভিযানের বিজয় কথা। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রামায়ণ বিচার করেছেন। রামের রূপ নবদূর্বাদলঘনশ্যাম, সীতা অর্থে হলরেখা। তিনি মাটি থেকে উঠেছেন এবং ধরিত্রমাতার গর্ভেই ফিরে গেছেন। ব্রহ্মর্ষি জনক নিজে হাতে হাল চাষ করতেন। স্বর্ণের মোহে যখন কৃষিলক্ষ্মী চঞ্চল হন তখনই নেমে আসে দুর্ভাগ্য। সোনার হরিণকে দেখে সীতা কাতর না হলে রামায়ণ কাহিনী ঘটত না। সীতাকে বন্দী করে লুব্ধ রাবণ। এই প্রতীক রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্করবী'তে ব্যবহার করলেন। অহল্যা শব্দটির অর্থ (অ-হল্+য) হল চালনের অযোগ্য। ঋষি গৌতম অভিশপ্ত বলে যে ভূখণ্ড ত্যাগ করে গেলেন রাম তাকে শস্যশ্যামলা করে তুললেন। নবজন্ম হল তার। এরই প্রতীকী রূপে রামের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমোচন।

রামায়ণ আর্য বাল্মীকির রচিত হলেও এর শিকড় আছে লৌকিক কথায়। সব মহাকাব্যের কাহিনীসূত্র সারা দেশ জুড়ে বহু বৎসরব্যাপী ছড়ানো থাকে। শক্তিমান কবি সেইসব উপাদান সুগ্রথিত করে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী রচনা করেন।" রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণ কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটি পূর্ব সূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[২] মনে রাখতে হবে বাল্মীকি রামায়ণের

কাহিনী শোনেন নারদের কাছ থেকে। নারদ ছিলেন গন্ধর্ব। লোকগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকা স্বাভাবিক। পরে বাল্মীকি ব্রহ্মার কাছ থেকে সমর্থন পেলেন। অর্থাৎ লোকগীতকে সংস্কৃত করা হল।

রাম শব্দটির বহু অর্থ পাওয়া যায়। সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ আরাম বা শান্তি। গবেষকগণ বলেন কথাটি আবেস্তার রামাহুর থেকে এসেছে। উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আবেস্তার প্রভাব বেশি ছিল। যার জন্য সিন্ধুসভ্যতায় বেদের থেকে আবেস্তার প্রভাব বেশি। এই সভ্যতার ধারা সমুদ্র-বাণিজ্যপথে পূর্বভারতে প্রসারিত হওয়া সম্ভব। "রাম শব্দটির যত রকম অর্থ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় (১) শব্দটি অবৈদিক (২) মিশ্রজাতির প্রতি ইঙ্গিতবহ এবং (৩) মেঘনির্দেশক।"[৩] লব ও কুশ এই দুটি নামের মধ্যে কৃষিসত্তা অর্থাৎ উদ্ভিদের বীজ থেকে আবির্ভাবের তথ্য লুকিয়ে আছে।

রামায়ণের প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের পঞ্চদশশত শ্লোকটি অতি বিখ্যাত

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি প্রকৃতপক্ষে মেঘবন্দনা। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী - "মা অর্থ লক্ষ্মী, নিষাদ, নিষদ এবং নিষাধ-এর প্রকৃত অর্থ পতি। সুতরাং মা নিষাদ শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ নারায়ণ। নার (জল)-এর যা অয়ন (শয়ন , আশ্রয়)। সহজ কথায় মেঘ। বসুন্ধরার কন্যা সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা। সীতা অর্থ হলরেখ। কৃষিকাজের সার্থকতা মেঘের বারিবর্ষণে। বিনা জলে কর্ষিত জমি বন্ধ্যা অর্থাৎ অ-লক্ষ্মী। ক্রৌঞ্চ অর্থ রাক্ষস বিশেষ। রক্ষ (রক্ষা করা) ধাতু নিষ্পন্ন রাক্ষস শব্দের অর্থ, যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়।

প্রাণীজগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের মূলে দ্যাবাপৃথ্বী। স্থূল ভাবে, দ্যৌঃ অর্থ অন্তরীক্ষের সূর্য এবং পৃথ্বী অর্থে কর্ষণযোগ্য ভূখণ্ড, এই দুইয়ের সংযোগ মূলতঃ মানব সমাজের অগ্রগতির উৎস। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহে জীবজগৎ যখন অস্থির হয়ে ওঠে, বর্ষার মেঘ এসে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। এই শ্লোকটিতে গ্রীষ্মকালীন দ্যাবাপৃথ্বীকে রহস্যে ক্রৌঞ্চমিথুন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূর্য এবং পৃথিবী সকল সময়েই মিথুনাবদ্ধ থাকলেও দক্ষিণায়নের

প্রাক্‌কালে সূর্যতেজে ধরিত্রী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্যে কামমোহিত বলা হয়েছে ।

অতএব আদি শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায়, "দ্যাব্যাপৃথ্বীর দৌ:ক আচ্ছাদিত করে লক্ষ্মীপতি তুমি আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করো । এই অর্থে এটি মেঘবন্দনা ।"[৪]

পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস প্রধানত বাল্মীকির কাব্যটি অনুলেখন করেন সমগ্রভাবে । তবে মধ্যযুগের সব কাব্যেই প্রচুর প্রক্ষিপ্তি পাওয়া যায় । তার অন্যতম কারণ তখন ছাপাখানা ছিল না । কৃত্তিবাসেও তার ব্যতিক্রম হয় নি । তবে মোটামুটিভাবে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণটি একই কবির রচনা বলে গ্রহণ করা হয় । কৃত্তিবাসে বাল্মীকির মহাকাব্য ছাড়াও 'অদ্ভূত রামায়ণ' থেকে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা, 'আধ্যাত্ম রামায়ণ' থেকে বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে হনুমানের সঙ্গে সূর্যের সংঘর্ষ, 'জৈমিনির ভারতসংহিতা' থেকে লবকুশের হাতে তিন ভ্রাতা সমেত রামের মৃত্যু ও বাল্মীকির বরে তাদের পুনর্জীবন লাভ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে । তা ছাড়া 'যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ', 'দেবী ভাগবত', 'স্কন্ধপুরাণ', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' থেকেও তিনি অনেক আখ্যান নিয়েছেন । লোক-উৎস থেকে সংকলন করা হয়েছে গণেশের জন্মকথা । অনেকগুলি অংশ মনে হয় কৃত্তিবাসের মৌলিক কল্পনাপ্রসূত — তরণী সেন কথা, রামচন্দ্রের দ্বারা দেবীর অকালবোধন, রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, হনুমান-কর্তৃক সূর্যকে কুক্ষিতলে ধারণ ইত্যাদি । রূপকথায় যেমন থাকে, তেমনি অনেক দেশের রামকাহিনীতে আছে রাবণের প্রাণ লুক্কায়িত ছিল একটি বিশেষ দেওয়ালে । অধ্যাপক সুকুমার সেন জাভা উপকথার সঙ্গে ভারতের রামকাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য 'রামকথার প্রাক্‌ইতিহাসে' দেখিয়েছেন ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মূল লক্ষ্য ভক্তিরস সৃজন । বীরত্ব কাহিনীও ভক্তিভাবনায় আপ্লুত হয়েছে । এমন-কি রাবণের শত্রুতাও ভক্তির বহি:প্রকাশ । ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে বলে, ভক্ত হিসাবে ঈশ্বর ভজনা করলে সাত জন্মে মুক্তিলাভ করা যায়, শত্রু হিসাবে করলে তিন জন্মে । কারণ ভগবানের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ যে-কেউ করতে পারে না । রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সব কঠিন কাজ করিয়াছিলেন, তাহার দু:সাধ্যতা চলিয়া যায় । সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না । তখন যে

ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয় কাব্যে সেই ভাবটিই প্রবল হইয়া উঠে। সেই ভাবটি ভক্তি-বৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম, পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। ..... এই রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।"[৫]

কৃত্তিবাস বাল্মীকির মতো অনার্য ও আর্যগাথাকে একত্র করেন নি। তাঁর যুগে রামায়ণ আর্যকাব্য হিসাবে খ্যাত। বাংলাদেশে সুলতানী রাজত্বকালে সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে একটি আত্মিক ও মানসিক বন্ধন আনার জন্য অনার্য মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন দৈবী ও পৌরাণিক মহিমার ছত্রছায়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনই আর্য কাহিনীগুলি দেশীয় ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছিল। সমাজসচেতন হিন্দুরা এই ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সাহিত্য ছিল সে যুগের একমাত্র মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপনের মতো স্থূলভাবে নয় কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ভেবে সমাজের উচ্চাবচ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সহানুভূতির ভাব জাগ্রত করার চেষ্টা দেখা যায়। রামায়ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। জাতীয় প্রয়োজনে বীরত্ব ও যুদ্ধ অপেক্ষা ভক্তিরসকে বড়ো করা হল। কারণ দীর্ঘ তুর্কি অভিযানের পর বাংলাদেশ তখন পাঠান ও সুলতান আমলে ধীরে ধীরে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। অতএব ভক্তিরসের দ্বারা মানসিক নমনীয়তা আনা প্রয়োজন।

কৃত্তিবাসের পর মধ্যযুগে আরও রামায়ণপালা বা পাঁচালী রচিত হলেও তার প্রায় কোনোটিই বিশেষত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ছাত্রপাঠ্য সাহিত্যের ইতিহাসের বাইরে তার স্থান নেই। বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের প্রথম দিকের বলিষ্ঠতম কবি মধুসূদন নির্বাচন করে নিলেন প্রাচীন রামকাহিনী – যদিও সম্পূর্ণ নয়, খন্ডাংশ। কিন্তু তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে এতাবৎ পরিচিত কাহিনীটির গঠন অক্ষুন্ন থাকলেও চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। মধুসূদনের যুগ থেকেই স্বাজাত্য মহিমা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মেকলে যে উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নি। কারণ, এ যুগে শুধু ইংরাজি ভাষা নয়, ঐ ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যজগতের ধ্যান জ্ঞানও এ দেশে এসে পড়ে। এমে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ভারতীয়দের মনে স্বদেশ প্রেমের ধারণা গড়ে ওঠে। যদিও, ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণের কথা তখন কারো মনে হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের পীড়ক শোষক রূপে চিহ্নিত

করেছেন এবং দেশভক্তরূপে শিখ ও রাজপুতদের, মধুসূদন তেমনই পীড়ক শোষক রূপে দেবতা ও রামলক্ষ্মণকে এবং দেশভক্ত রূপে রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে রূপায়িত করেছেন । মধুসূদনের রাবণ প্রজানুরঞ্জক, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী । বীরত্বে অভিমানে একজন সম্পূর্ণ মানুষ । অন্যদিকে রাম কাপুরুষ । তাঁর নিজস্ব কোনো শক্তি নেই । দৈবশক্তির সাহায্য না পেলে তিনি কিছুতে বিজয়ী হতে পারতেন না । এখানে আবার দেবতারাও কৌশলের আশ্রয় নেন । মহামায়া মায়া দ্বারা শিবকে বশীভূত করেন । মায়াকে ছলনার আশ্রয় নিতে বলা হয় । লক্ষ্মণের বিশেষণ হিসাবে মধুসূদন লেখন 'উর্মিলা বিলাসী', তার প্রতিদ্বন্দ্বী 'মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ' ।

'মেঘনাদ বধ' কাব্যটিতে রাবণপুত্র বীরবাহুর মৃত্যু থেকে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্যন্ত অংশ নেওয়া হয়েছে । কোনো নারী চরিত্রের চারিত্রিক পরিবর্তন তিনি করেন নি । যদিও সীতা চরিত্রে বাল্মীকির দৃপ্তা মনোবলের অধিকারিণী অপেক্ষা কৃত্তিবাসের দু:খিনী ছবিটি বেশি এসেছে । চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী চরিত্রে উন্নত চারিত্রিক মহিমা প্রকাশিত হয়েছে । পুরুষ চরিত্র পরিবর্তনের ফলে মিথের পরিবর্তন ঘটেছে এ কাব্যে । মধুসূদন কিন্তু পৌরাণিক ঘটনাগুলি অবিকৃত রেখেছেন ।

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উর্বরতাকেন্দ্রিক অপর এক মিথ নির্বাচন করে একটি অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, 'পতিতা' । এর মূলে আছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মিথ, এটি অতি ব্যবহৃত, বহুল পরিচিত, হিন্দু ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মেও পরিচিত । নানা দিক থেকে এই মিথটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ।

এই মিথ রামায়ণেই দুবার আছে । এমন-কি মহাভারতের বনপর্বেও লোমশ মুনি এই কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছেন । কাশ্যপপুত্র বিভাণ্ডকের একশৃঙ্গধারী এক পুত্র জন্ম নেয় মৃগীগর্ভে । তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ । তিনি মহাতাপস ছিলেন এবং গৌণ ও মুখ্য দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য পালন করতেন । অঙ্গদেশে রোমপাদ নামে এক মহাপ্রতাপশালী রাজার রাজত্বকালে রাজার অধর্মের জন্য ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয় । রাজা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে ব্রাহ্মণরা বিধান দেন ঋষ্যশৃঙ্গকে আহ্বান করে শান্তা নাম্নী রাজকন্যার বিবাহ দিলে এ পাপ কাটবে । ঋষ্যশৃঙ্গকে আনবার জন্য মন্ত্রীরা গণিকা নিয়োগ করলেন ।

উর্বরতার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন। অতএব সৃষ্টি হল বৃষ্টির দেবতা, মেঘের দেবতা। শুধু পূজাঅনুষ্ঠান নয়, নানা রিচুয়ালসও দেখা দিল। ম্যাজিক এল। নারীপুরুষের সঙ্গম, রেত:পাত, ফলত পুত্রবতী হওয়া এটি আরোপিত ম্যাজিকের মাধ্যমে। পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে বীজরোপণের পূর্বে নরনারী দীর্ঘ সংযমী জীবন যাপন করে শস্যক্ষেত্রে সঙ্গম করেন। উদ্দেশ্য মেঘ ও পৃথিবী যেন তাঁদের কর্তব্য ভুলে না যান। লৌকিক ব্রতকথায় 'মেঘরানীর ব্রত' তৈরি হয়েছে এ ভাবে।

এই ম্যাজিক মিথিক ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার বিবাহে ব্যবহার করা হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ তপোবলে ইন্দ্রকে দিয়ে বৃষ্টি নামাতে পারতেন।

রামায়ণে আবার দেখা যায় দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে চাইলে ঋষিরা বিধান দেন ঋষ্যশৃঙ্গকে আহ্বান করে রাজকন্য শান্তার সঙ্গে বিবাহ দিতে। অর্থাৎ বৃষ্টি, শস্য কামনা পুত্র কামনা সবই এক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।

শান্তাকে একাধারে রোমপাদ-কন্যা ও দশরথকন্যা বলা হলেও কোথাও তাঁর মাতার উল্লেখ নেই।

বৌদ্ধজাতকে এই জাতীয় দুটি কাহিনী দেখা যায়। একটিতে আছে একটি পবিত্র হস্তীর আগমনে বৃষ্টিপাত হবে অন্যটিতে ঋষ্যশৃঙ্গ নাম পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ অহল্যা কবিতার মিথ মনে রেখে তাকে মানবী রূপে কল্পনা করে প্রকৃতিমাতার জঠরস্থ থাকাকালীন সুপ্ত কোটি জীবসুখস্পর্শ স্পন্দিত পৃথিবীমাতার অনুভূতির অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'পতিতা' কবিতাটিতেও তেমনি সম্পূর্ণ মিথ গ্রহণ না করে তার মানবিক অংশটুকু নিয়ে আধুনিক কবি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলেন। কবিতাটি প্রথমে 'পূরবী' কাব্যের সঞ্চিতা অংশে ছিল, পরে কবির ইচ্ছানুসারে পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ, 'ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরে ভুলাতে' যে কয়জনা বারাঙ্গনাকে পাঠানো হয় তারই একজনকে নির্বাচন করেন। যে-ভাবে এই অরণ্যচারী, পূত চরিত্রের ঋষিকে মানুষের স্বার্থসর্বস্ব জীবনে ভুলিয়ে

আনা হয়েছিল, কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেই মহাঋষির যখন তিনি প্রথম নারীসান্নিধ্যে এলেন, এবং সেই নারী যিনি শুধুই অর্থবিনিময়ে এ কাজ করলেন কেমন হতে পারে তার সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া – এই কথা কবি 'পতিতা' কবিতায় এনেছেন। সেই নারী মন্ত্রীর আদেশ পালন করে নি। কারণ এই অপাপবিদ্ধ তাপসকুমারের যুগপৎ মুগ্ধ ও সরল দৃষ্টিতে সে নিজের নারীত্ব বহুদিন পর আবিষ্কার করেছিল। "ধন্য আমি রে ধন্য বিধাতা / সৃজিছ আমারে রমণী করি।" সে উপলব্ধি করল, 'আমি শুধু নই সেবার রমণী / মিটাতে তোমার লালসা ক্ষুধা'। অন্যান্য পিশাচী নারীদের হাত থেকে এই 'দেবশিশু সম' কুমারকে রক্ষা করা তার কর্তব্য মনে হল। ঋষির চোখে 'এ্যাসের তড়িৎ-চমক' দেখে ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে তাঁর সেবায় ব্রতী হল এই নারী। পরে তাঁর শুদ্ধ চিত্তের বন্দনায় নারী থেকে সে দেবতায় উন্নীত হল, 'আমি দেবতা' এবং এই ক্ষণ থেকে তার জীবনের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে উপলব্ধি করল এতদিনে তাকে কেউ আত্মিক দিক থেকে চায় নি বলে প্রাপক পেয়েছে 'মাটির ঢেলা'। পুরাণে অনেক বার পাওয়া গেছে পুরুষ সঙ্গমের পরেও দেবতার আশীর্বাদে নারী আবার কুমারী হয়। এখানে যেন তার নব ব্যাখ্যা। কুমার ঋষ্যশৃঙ্গের আন্তরিক প্রেমময় বাণীতে এত দিনের কুশ্রী জীবনের গ্লানি তার চোখের জলে ধুয়ে গেল।

"শুনি সে বচন হেরি সে নয়ন। দুই চোখে মোর ঝরিল বারি
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে। বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।"

কৌমার্য শরীরের নয়, মনের। এ ভাষ্য আধুনিক কবির। পতিতা নারী ঋষ্যশৃঙ্গের বন্দনায় সম্পূর্ণ আত্মশক্তিতে জেগে উঠেছে। 'দেবতারে তুমি দেখেছ। তোমার সরল নয়ন করে নি ভুল'। আর সে অপরাধবোধে পীড়িত নয়, ঐচ্ছিক লালসায় বিভ্রান্ত নয়। আপনার পথ, আপনার সত্য সে খুঁজে পেয়েছে।

পুরাণে যাদের কার্যোদ্ধারের যন্ত্রমাত্র মনে করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাদের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই কামের পক্ষে প্রেমের জন্ম ও প্রেম থেকে চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে তাঁর 'পতিতা' কবিতায়। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের মূল উর্বরতাকেন্দ্রিকতার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি। এটি গ্রহণ করলেন বুদ্ধদেব বসু। "আমাদের কালের অনুর্বরতা, হতাশা, কামক্লিষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে এক জীবনের আশ্বাস উত্তরণের ইশারা খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণের

মধ্যে ।"[৬] আমাদের আদিমতম মিথকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে, ধর্মে দেহভাবনাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । বস্তুত পুরাণে বার বার দেখা যায় কামকে স্বীকার ও গ্রহণ করার ফলে কোনো তপস্বীর ব্রতচ্যুতি ঘটে নি । এই নাটকেও তা আছে । হিন্দুরা কামকে অস্বীকার তো করেন নি, বরং তাকে আদিশক্তি বলেছেন । কিন্তু সেই শক্তিকে সাধনার দ্বারা রূপান্তরিত করতে হবে । উন্নত ও অসাধারণ মানুষ তাঁদেরই বলা যাবে যাঁরা তা করতে পারবেন ।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মরচে পড়া পেরেকের গান'[৭] কবিতায় প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ নিয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "য়োরোপীয় হোলি গ্রেইল উপাখ্যানের যেটি অখৃষ্টীয় ও প্রাচীনতর অংশ, অনেক পণ্ডিতের মতে তার আদি উৎস এই ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনী ।"[৮] এ কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের অভিশপ্ত জীবন একটি মরচে পড়া সামান্য পেরেকে পরিণত, তাও সেটি লেগে আছে একটা পচা কাঠের টুকরোতে । তার অভিশাপের কারণ যে নারী তাঁর পৌরুষকে জাগিয়েছিল তাকে সে ভুলতে পারে নি । পারে নি বলে তার বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন তিওক্কাম রাত্রি । 'তিওক্ আমার মন্ত্রপূত মিলন, উৎপীড়িত আমার বীজস্রোত ।' এই কাব্যগ্রন্থে 'তপস্বিনী'[৯] কাব্যনাট্য থেকে কবিতা সংকলন করা হয়েছে ভাব সাযুজ্যের জন্য ।

বুদ্ধদেব বহুদিন মিথের মধ্যে আত্মানুসন্ধান করেছেন । তাঁর দীর্ঘপ্রয়াস সফলতা লাভ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথে । এর মধ্যে তিনি 'আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা' (ভূমিকা — 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী, বুদ্ধদেব বসু) সঞ্চার করতে যেমন চেয়েছেন, তেমনই তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় কামকে অবলম্বন করে প্রেমে ও প্রেমকে অবলম্বন করে বিশ্বচৈতন্যে উত্তরণও এসেছে । বর্তমান বন্ধ্যা সভ্যতার পিপাসা তিনি বৃষ্টির জন্য হাহাকারের রূপকে পরিণত করেছেন । আধুনিক যুগের অবক্ষয় রোধ করতে পারে প্রেম । কিন্তু তাঁর মতে প্রেম বিদেহ নয়, কামাশ্রিত । সেইজন্য বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার মতো একটি অংশমাত্র গ্রহণ না করে কালীপ্রসন্ন সিংহ — অনূদিত মহাভারতের সমগ্র কাহিনী কাঠামো রূপে নিয়েছেন ।

বুদ্ধদেব বসু লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণী নামে যথাক্রমে মা ও মেয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন । এরা ঋষ্যশৃঙ্গ বিজয় অভিযানে বৃদ্ধা নেত্রী ও তাঁর যৌবনবতী কন্যা । 'তপস্বী ও

তরঙ্গিণী' চার অঙ্কের এক সম্পূর্ণ নাটক । এখানে বহু চরিত্র, বহু ঘটনা । সংস্কৃত মিথিক আবহাওয়া যেমন রক্ষিত, তেমন গ্রীক মিথের কোরাসও রাখা হয়েছে । নানা রিচ্যুয়াল-এর বর্ণনা । এ বিবাহ রাজনৈতিক বিবাহ, প্রেমবিবাহ নয় । প্রেমহীন কামের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ যখন কামময় প্রেম উপলব্ধি করতে পারলেন তখন তাঁর জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হল । তরঙ্গিণী, তাঁর প্রেমিকা, উপলব্ধি করল কামজাত ধ্রুব প্রেম ।

শুধু ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী নয়, অংশুমান ও শান্তা, চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী – এদের প্রেমের মধ্যে আবহমান সাধারণ নরনারীর প্রেমের কথা আছে । নায়ক নায়িকা "অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নি:সঙ্গ চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হল দুজনে" । তবু পৃথিবীতে বীজবপন বন্ধ হয় না । তাই নাটকের পাত্রপাত্রীদের মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ।

ব্যক্তি মিথের আলোচনায় কোন কোন চরিত্রকে নেওয়া হবে – বাছাই-এর হেতু প্রথমে বলে নেওয়া উচিত । ব্যক্তি মিথের বিবর্তনের ধারায় কাব্যে উর্বশী ও বেহুলালক্ষ্মীন্দর চরিত্র, নাটকে দ্রৌপদী ও চাঁদসদাগর ও কাব্যনাট্যে অর্জুন, কৃষ্ণ ও কর্ণকে গ্রহণ করা হয়েছে । এ নির্বাচনের পিছনে যে মনোভাব কাজ করেছে তা হল মিথগুলির অপূর্বতা ও বাংলা সাহিত্যে তাদের পৌন:পুনিকতা । চরিত্রগুলি প্রতিটি অসাধারণ এবং এমনই তাদের আবেদন যে যুগে যুগে তারা নতুন ভাবে পরিবেশিত হতে পারে । যেন প্রতি যুগের আবহাওয়াতে আবাহসংগীত হয়ে বেজে উঠতে পারে । এঁরা পুরাতন হয়েও নিত্য নবীন । অনেক কবি হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে বা পৃথক ভাবে এঁদের নিয়ে কাব্য বা নাটক রচনা করেন নি কিন্তু তাঁদের বওব্যে বারংবার উঠে এসেছে এ-সব চরিত্র ।

ব্যক্তি মিথের বিবর্তন : উর্বশী ।

স্বর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর কাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে, ঋক, অথর্ব, শুক্ল, যজু, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহৎ দেবতা, বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও কথাসরিৎসাগরে । এ-সবের মধ্যে প্রাচীনতম ঋকবেদের সংবাদ সূক্তে উর্বশীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।

শুধু ভারতীয় পুরাণে নয়, ভাবসাযুজ্যে উর্বশী আন্তর্জাতিক মিথ । উর্বশী তাঁর খাটের পাশে দুটি মেষ বেঁধে রাখতেন । শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন গ্রীক পুরাণ ও ভারতীয় পুরাণে এই জাতীয় এক প্রতীক দেখা যায় ।[১০] জিয়ুস, হংসরূপধারিণী লিডার সঙ্গে উপগত হয়েছেন । উবশী স্বয়ং ছিলেন হংস অপ্সরী । অশ্বিনীর রথ কখনো হংস, কখনো ঈগল, কখনো মহিষ দ্বারা বাহিত হয় । মেষও তাঁর প্রিয় পশু । ওদিকে ক্যাস্টর ও পোলাক্স বা পলিদিউস এই যমজ দেবতা সবসময় পশু ও পশুদৌড় প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত ।

দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী বলছেন, ইয়োরোপে তুষার যুগে লাল রিলিফে উৎকীর্ণ মাতৃকার যে মূর্তিটি পাওয়া যায় সেটি উর্বশী মূর্তি ।[১১] য়ুরোপীয় প্রস্তরযুগে হাড়ের ওপর চিত্রিত মাতৃকামূর্তি পাওয়া যাচ্ছে । কোশাম্বী তাঁর গ্রন্থে একটি প্রাচীন উর্বশী মূর্তির ফোটোগ্রাফও দিয়েছেন । সেটি বর্তমানে ফ্রান্সে রক্ষিত ।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকটি অবলম্বন করে কোশাম্বী প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্রাচীন যুগে গ্রাম ও তার জলউৎস থেকে দুই-এক মাইল দূরত্বে পাহাড়ের ঢালে বা ছোটো টিলাতে মাতৃকামূর্তি স্থাপিত হত । কারণ সে যুগে জল ও খাদ্যের জন্য মানুষকে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে হত । এই মূর্তিগুলি থেকে সে-সব পথের নির্দেশ পাওয়া যেত ।

লৌহপূর্ব যুগে প্রস্তর স্তূপ দিয়ে তৈরি যতগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি মাপে, ধরনে ও গঠনগত কৌশলে এক । A.C. Callayle দক্ষিণ মীর্জাপুরের গুহা থেকে এগুলি পেয়ে ১৮৮৫ সালে রিপোর্ট দেন । কোশাম্বীর মতে কৃষিসভ্যতা বিকাশের আগে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানা উৎসব বিশেষত উর্বরতাকেন্দ্রিক উৎসবের জন্য মিলিত হত । সেইসঙ্গে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে অর্থনীতি বজায় রাখত । তাদের চলাচলের পথে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে মাতৃকামূর্তি স্থাপিত হত, এ কথাও যুক্তিযুক্ত ।

মহাভারতে যে উর্বশী - পুরুরবার প্রেমকাহিনী আছে অনেক পন্ডিতের মতে তাই হল প্রাক্‌বৈদিক যুগের সূর্য - উষা মিথ, এবং গ্রেকো রোমান অ্যাপোলো-দাফনে মিথ । এটি মর ও অমর ভালোবাসার রূপক হিসাবে চিহ্নিত । অন্যমতে পুরুরবাই সূর্য ও উর্বশী প্রভাতের

কুয়াশা। অপ্সরা শব্দটি আসছে অপ্ অর্থাৎ জল থেকে। জল আলোর প্রতি আকৃষ্ট হল কিন্তু মিলন সম্ভব নয়। সূর্য উদিত হলে কুয়াশা মিলিয়ে যায়। অ্যাপোলোও কোনোদিন দাফনেকে পান নি।

ভারতীয় পুরাণে উর্বশীর সঙ্গে পুরুরবার বিবাহের কাহিনী আছে। কিন্তু এক-এক পুরাণে এক-এক ভাবে। মহাভারতে অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করতে স্বর্গে আসেন তখন উর্বশী ইন্দ্রের আদেশে তাঁর ব্রতভঙ্গ করতে যান। কিন্তু প্রপিতামহী বলে অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উর্বশীর অভিশাপ আসে, এক বৎসর নপুংসক হয়ে থাকতে হবে। বিরাট রাজার সভায় আত্মগোপন কালে এই শাপ বর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সাহিত্যের ধারায় দেখা যায়, কালিদাস দেখান কেশী দৈত্য উর্বশীকে হরণ করার সময় বীরসম্রাট পুরুরবা তাঁকে উদ্ধার করেন। উভয়ে প্রণয়াসক্ত হন। স্বর্গে একদিন অভিনয়ের সময়ে প্রেমমুগ্ধা উর্বশী ভুল করে পুরুরবা নাম উচ্চারণ করে ফেলায় ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গচ্যুতা হন ও পুরুরবাকে বিবাহ করেন।[১২]

মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী'[১৩] নামক পত্রকাব্যে এই কাহিনী গ্রহণ করেছেন। তিনি এখানে ভরত ঋষির শাপের কথা বলেছেন, ইন্দ্রের নয়। বরং মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ তাঁর মনের ভাবে কৌতুকে হেসেছেন। এই কবিতায় অপ্সরার দ্বিধাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তার সঙ্গে ভারতীয় নারীর চিরন্তন শক্তির প্রকাশ, প্রিয় লাভের জন্য, "ভূমিষ্ঠ ভাবে পূজিয়াছি প্রভু। কল্প তরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।" বার বার খৃস্টান মধুসূদনের মধ্যে যে খাঁটি বাঙালিত্ব দেখা গেছে, যার ফলে রক্ষবধূ সরমা সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দিতে আসেন, এখানেও তার প্রতিধ্বনি। একদিকে দীপ্তিময়ী অপরদিকে ভক্তিমতী ভারতীয় উর্বশীকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন।

উর্বশী ধারণার নির্যাসটি গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য সন্ধান দেখা যায়। তাঁরা জানেন বাস্তবকে জানতে, দর্শনীয় বস্তুকে গ্রহণ করতে হয়। তবু চোখে দেখাই সব নয়। কল্পনা তাঁদের কাছে অনেক বড়ো এবং মনের দেখাই

চরম সত্য । বিশ্বপরিব্যাপ্ত ও পরমশক্তিকে বস্তুজগতে পাওয়া সম্ভব নয় । বিহারীলাল চক্রবর্তী যাঁকে সারদা বলছেন, কীট্‌সে যা রূপ পাচ্ছে 'অটাম' ও 'নাইটিংগেলে', লেকতীরবর্তী অন্যান্য কবিদের তিনিই The Ideal Beauty,' 'The Eternal Woman', 'A World of Spirit' and 'A thing of beauty is joy for ever.'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের কর্ণধার তাঁর জীবনদেবতা । তিনিই তাঁর কল্পনার লীলাসঙ্গিনী, একাধারে মধুর ও রহস্যময় । এরই রূপায়ণ বা personification উর্বশী । তিনি কোনো সামাজিক বন্ধনে বন্দী নন । বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশি উঠেছেন । তাঁর পূর্বসংস্কার নেই, মুকুলিকা বয়স অতিক্রম করে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি যৌবনের দ্বারে পৌঁছন নি । তিনি স্ব প্রকাশিতা । "যখন জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা / পূর্ণ প্রস্ফুটিতা ।"[১৪]

রোম্যান্টিক কবিদের ভাবনাকে রূপায়িত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মিথ গ্রহণ করেছেন । বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ সৌন্দর্যের রূপ দেওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু উষার সঙ্গে উর্বশীর তুলনা করলেও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে 'উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা ।' পৌরাণিক উষা আলো-অন্ধকারে মেশা, সূর্যের আলোয় তার বিনাশ । এ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ।

উর্বশীর পৌরাণিক রূপকল্পনার সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক মিথভাবনাও প্রতিফলিত 'শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল' কামনা বাসনার থেকে প্রেমের জন্ম । উর্বশী কামের প্রতীক । তাঁর সৌন্দর্য লক্ষ্মীর মতো গার্হস্থ্য, শ্রী ও শান্তি মন্ডিত নয় । প্রখর উন্মাদনাময় । 'দুইবোন'[১৫] উপন্যাসের গোড়ায় কবি মেয়েদের দুই জাতের কথা বলেছেন, "মেয়েরা দুই জাতের কোনো পন্ডিতের কাছে এ কথা শুনেছি । এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া ।'

"কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
নবীন মিলন সুখে .....
....

আজি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে ।" (রাতে ও প্রভাতে)

'রাত্রে ও প্রভাতে' তার প্রতিফলন ।[১৬] উর্বশীর ভাবব্যাখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন, "নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক । ..... সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত — তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই । সে অবিমিশ্র মাধুর্য ।[১৭] উর্বশী পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়ে তাকে সৃষ্টির কাজে ব্রতী করেন ।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর ভাবনায় গ্রেকো রোমান মিথও কাজ করেছে । সমুদ্র মন্থনে উর্বশীর উত্থান এই ভাবনার সঙ্গে ভেনাসের কল্পনা যেমন মিশে গেছে তেমনই ভেনাস কল্পনার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ এসেছে 'মুক্তকেশী বিবসনে' শব্দগুচ্ছ । কারণ ভারতীয় পুরাণে যৌনতা অস্বীকার করা না হলেও নগ্ন নারীসৌন্দর্য বর্ণনা অনুমোদিত ছিল না । 'কুন্দশুভ্রনগ্নকান্তি' বিদেশিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয় । আর্যরা গৌরবর্ণ ছিলেন বলেন অবশ্য লোকে । কিন্তু তাঁদের সৌন্দর্যের মানদন্ড রাম এবং কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নন, এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাঁদের কাছে দ্রৌপদী কৃষ্ণা ।

আলোচ্য কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ 'বিকশিত, বিশ্ব বাসনার অরবিন্দ মাঝখানে / পাদপদ্ম রেখেছ তোমার ।' এখানে বাসনাকে চূড়ান্ত মাহাত্ম্যে উন্নীত করা হয়েছে । যার জন্য অরবিন্দ তথা পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । হিন্দু তন্ত্রে পদ্ম সমস্ত তত্ত্বের সার ।

বিষ্ণু দে'র উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ[১৮] কবি নিজেকে পুরুরবার সঙ্গে একাত্ম করেন নি । স্পষ্টই বলছেন, 'আমি নহি পুরুরবা'[১৯] তাঁর ভুবন ক্ষণিক আনন্দের । সেখানে চিরদিনের সঙ্গী হিসাবে নয়, ক্ষণকালের জন্য উর্বশীকে স্মরণ করেছেন । 'ক্ষণিক সেথায় থাকো' — 'তুমি শুধু থাক ক্ষণকাল' । কারণ ঐ ক্ষণিক মিলনের সৌন্দর্য ইন্দ্রধনুর মতো, ক্ষণকালের জন্য হলেও অমর । আধুনিক মানুষ তেমনভাবে চিরন্তন সম্পর্কে বিশ্বাস করে না । তিনি জানেন সৌন্দর্যকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না । কিন্তু এই রূঢ় বাস্তব পৃথিবীতেও সৌন্দর্য আসে । 'আমরণ-আসঙ্গ

লোলুপ' হলেই বরং তাকে হারাতে হয় । তিনি তাই 'ক্ষণিকের ঘর অলকায় / ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, যে ভুবন' গড়ে তোলেন সেখানে অল্প সময়ের জন্য উর্বশীকে আমন্ত্রণ করেন ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী'[২০] কাব্যগ্রন্থের উর্বশী কবিতায় কবির নিজস্ব মানসিকতার পরিবর্তনে তাঁর প্রেয়সী যৌবনে উর্বশীত্ব লাভ করেন ।[২১] প্রৌঢ়ত্বে বিদায় নেন । 'একদা কোন তৃষ্ণা বিধুর বিনিদ্র রাতে' যৌবনের পূজায় তাঁর মনে হয়েছিল 'লুপ্তস্বর্গ উর্বশীর উদয় হয় অবনীতে ।' বার্ধক্যে যখন দেহের সুখের লালসা চলে গেছে, প্রেমের মৃত্যু হয়েছে । আজ সেই নারীকে আর আকর্ষক মনে হয় না । এই সমুখে তিনি সচেতন ।

'রিক্ততা মোর, নগ্নতা মোর, দৈন্য দেখি
উর্বশী আজ পালিয়েছে কি ?'

উর্বশী কামময়ী । দেহজ কামের মৃত্যুর সঙ্গে কবির কাছে তিনি অপসৃতা ।

সমর সেনের কবিদৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ তির্যকতা ছিল যা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত এবং বাস্তবসচেতন মননশীলতার ফসল । তিনি উর্বশীকে দেখেন সেবাসদনে অপেক্ষমাণ, আসন্নপ্রসবা । রবীন্দ্রনাথ যাঁকে স্বর্গীয় মূর্তি রূপে এঁকেছেন সমর সেন তাকে মধ্যবিত্ত জীবনে বাস্তবের সমতলে নামিয়েছেন ।

'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রঙে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো ।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ন মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে ।'[২২]

আমাদের মধ্যবিত্ত রঙে দিগন্তের দুরন্ত মেঘের রঙ লাগে না । অতএব আসন্নপ্রসবা ক্লান্ত রূপে যদি বা উর্বশীর রমণীরূপ প্রকাশিত না হলে আমাদের গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে ।

ব্যক্তি মিথ : লক্ষীন্দর / লক্ষীন্দ্র

চাঁদ সওদাগর ও তার পুত্র লক্ষীন্দ্র তথা লক্ষীন্দর, পুত্রবধূ বেহুলার কাহিনী বাংলাদেশের নিজস্ব কাহিনী। অবশ্য বিহার এবং আসামে প্রায় একই কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু এককালে বাংলাদেশের আয়তন এত ক্ষুদ্র ছিল না, পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলির অনেকাংশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কাহিনীটি সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্গত নয়, যদিও পরবর্তী অর্বাচীন পুরাণগুলিতে স্থান পেয়েছে। এটি লোকমানসের অতি প্রিয় কাহিনী। জনমানসের নিজস্ব। বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব মিথ বলে জীবনানন্দ এটি গ্রহণ করেছেন। বস্তুত এ যাবৎ তাঁর নাম উচ্চারিত হয় নি। সমগ্র বাংলাদেশ তার নিসর্গ বিষণ্নতা নিয়ে জীবনানন্দের কাব্যে এসেছে। হাজার হাজার বছর পৃথিবীর পথ হাঁটলেও বাংলা তার কাব্য থেকে কোনো সময়ে সরে যায় নি। মনে হয় তাঁর সোনালী চিল, ধানসিঁড়ি নদী, রেশমী ইঁদুরই মিথে পরিণত হবে একদিন, অন্তত কাব্যীয় প্রবাদে। 'রূপসী বাঙলা'র কথায় স্বতই ভেসে আসে চাঁদ সদাগর ও মধুডিঙার কথা, কালীদহের 'ফসলের নীল ছায়ার বাংলার অপরূপ রূপ।' মঙ্গলকাব্যের উজ্জ্বল চরিত্র বেহুলা যিনি প্রেমের জন্য কঠোর ত্যাগের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন তিনিও এসেছেন। কবির মনে হয় শবদেহ নিয়ে যেতে যেতে গাঙুড়ের জলে বেহুলা শুনেছে শ্যামার নরম গান', কবি দেখেন এলানো খোঁপায় 'সনকার মুখ।'

বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে —
কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় —

.....

একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তাঁর কেঁদেছিল পায়।[২৩]

বিষ্ণু দে বেহুলাকে দেখেছেন স্রোতস্বিনীর মতো। গতিময়তা, সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের শক্তির আধার স্রোতস্বিনীর বেহুলা তাঁর কবিতায় একাত্ম হয়ে গেছে। জলই জীবন। তাই নদীই পারে লক্ষীন্দরকে নতুন জীবনে এনে দিতে। জীবনকে জাগিয়ে তুলতে তিনি বলেন,

"তোমার চলায় ভাসাও স্রোতস্বিনী
কাঠ খড় ফুল এবং লখিন্দর।"[২৪]

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যেও লক্ষ্মীন্দর মিথ ফিরে আসছে। কিন্তু এখানে বেহুলার ভেলা স্বর্গের দিকে না গিয়ে নরকের দিকে গেছে। বাস্তববাদী কবি মৃতের নবজন্মে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কারণ তিনি দেখেছেন অজস্র অসহায় মানুষের অকারণ মৃত্যু, মানুষের লোভ তার জন্য দায়ী। রক্তবাহিত ঐতিহ্যে বেহুলার ভেলাকে নানা সুখকল্পনায় সজ্জিত করলেও সেখানে প্রেমবতী নারী বা মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্ঠা নেই।

'পরিত্যক্ত মৃত দেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে
অসহায়।'[২৫]

সূত্র নির্দেশ

১। সাংকালিয়ার এইচ·ডি· — Ramayan, Myth and Reality.
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রামায়ণের উৎস কৃষি' বইটি থেকে প্রাপ্ত সূত্র।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রাচীন সাহিত্য। রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৬২।

৩। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'রামায়ণের উৎস কৃষি', প্রকাশক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রজত জয়ন্তী পূর্তি দিবস, ১৫ জুন, ১৯৮৫।

৪। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'রামায়ণের উৎস কৃষি' — প্রকাশক রথীন্দ্রকুমার পালিত, পাবলিকেশনস্ অফিসার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ রজত জয়ন্তী পূর্তি দিবস, ১৫ জুন ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৩।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রাচীন সাহিত্য। এয়োদশ খন্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৬৬২

৬। কমলেশ চট্টোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার — মডার্ন বুক এজেন্সি লিমিটেড, ১ম সংস্করণ।

৭। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ — সম্পাদক নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশার্স ১৩৮৭, অগ্রহায়ণ। অষ্টম সংস্করণ।

৮। বুদ্ধদেব বসু — 'মর্ত ও অমর্ত্য' নরনারী বিশেষ সংখ্যা, যৌনতা ও ধর্ম প্রবন্ধ সম্পাদক সুবোধ মিত্র, ২৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৮৪।

৯। বুদ্ধদেব বসু — তপস্বী ও তরঙ্গিণী, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৬৬

১০। Bhattacharya, Sukumari - The Indian Theogony.

১১। Kosambi - Myth and Reality - Popular Prakashan, Bombay 1962 - Publisher G.R. Bhatkal.

১২। রঘুবংশম — সংস্কৃত সাহিত্যে সম্ভার — নবপত্র প্রকাশনী।

১৩। মধুসূদন রচনাবলী — বীরাঙ্গনা কাব্য। দশম সর্গ, পৃষ্ঠা - ২১০ — মডেল পাবলিশিং হাউস। মাঘ ১৩৯০, মডেল সংস্করণী।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী — প্রথম খন্ড, চিত্রাকাব্য, পৃষ্ঠা ৫১০। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা - ৭২৯

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্কর, প্রথম খন্ড, চিত্রকাব্য, পৃষ্ঠা - ৫২৯

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সঞ্চয়িতা, কাব্যপরিচয় অংশ, বিশ্বভারতী প্রকাশনা বিভাগ।

১৮। বিষ্ণু দে — শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা প্রকাশনা, জুন ১৯৫৫।

১৯। বিষ্ণু দে — শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ১৩।

২০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংকলন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯, দে'জ পাবলিকেশন।

২১। ঐ

২২। সমর সেন — সমর সেনের কবিতা। সিগনেট প্রেস, ষষ্ঠ পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৪।

২৩। জীবনানন্দ দাশ — রূপসী বাংলা — ভারবি । দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪৬ ।

২৪। বিষ্ণু দে — শ্রেষ্ঠ কবিতা, সিগনেট প্রেস, কবিতা 'উর্বশী', পৃষ্ঠা - ১৩ ।

২৫। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — 'মহাদেবের দুয়ার' কবিতা । বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিতাবলী — ১ম খণ্ড অনুষ্টুপ ১৯৮৯ ।

—